খণ্ড ৫, সংখ্যা ৫-৬ | ভাবনগর | জুন-অক্টোবর ২০১৬
Vol. 5, No. 5-6 | BHĀBANAGARA | June-October 2016

বাংলার জাগরণে লোকায়ত দর্শন ও লোকজ সংস্কৃতির ভূমিকা

শামসুজ্জামান খান

বৌদ্ধদের সাধনার বিভিন্ন মার্গ নিয়ে চিত্রকলা

The Role of Atheistic Philosophy and Folk Culture in Bengali Renaissance

Shamsuzzaman Khan

Abstract

Against the urban based renaissance of 19th century, a kind of sense of collective spirit and secular values pregnant with humanitarian conscience developed in the folk-thoughts influenced with the thinking and philosophy of the Yogis, Tantrics, Vaisnavas, Sufis, Bauls, Kabials and Boyatis. Their austerity was enriched with the humanitarian thoughts, positive strategies and tolerances as per various sources and thus a merged philosophy of "superiority of human" established. The West-influenced fragmented renaissance in19th century had no authority over the vast grassroots level Bangladesh. But the secular philosophy of the rural ascetic austere, Moromia and Aul-Baul-Fakir created an affluent, secular and collective national sensibility.

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ নানা আঙ্গিক ও মাত্রায় নানা সময়ে নানাভাবে আলোচিত এবং সমালোচিত হয়েছে। অনেক বিগদ্ধজন, সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষক ওই জাগরণকে প্রকৃত জাগরণ না বলে খণ্ডিত জাগরণ হিসেবে আখ্যাত করেছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত একে নগরবাসী, উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের জাগরণ হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। বাঙালি মুসলমানের এতে অংশগ্রহণ একেবারে ছিল না বলেই মনে হয়। কারণ তারা তখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ছিল একটি গ্রামীণ পশ্চাৎপদ সমাজের মানুষ। ফলে অসম বিকাশের পটভূমিকায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতারও কিছু ছোপ লেগেছিল। তাই আধুনিক মানবিক চিন্তাচেতনাসমৃদ্ধ জাগরণে যে বিপুল সামাজিক অগ্রগতি এবং যুক্তিবুদ্ধিভিত্তিক গণতান্ত্রিক ও জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটে তা ওই জাগরণে লক্ষ করা যায় না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নগরভিত্তিক ওই জাগরণের বিপরীতে গ্রামবাংলার কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও এক ধরনের মানবিক চেতনাসমৃদ্ধ সামূহিক ঐক্যচেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেছিল যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, সুফি, বাউল এবং কবিয়াল ও বয়াতিদের চিন্তাচেতনার সমন্বয়ে গঠিত লোকদর্শনে। তাদের সাধনায় নানা উৎস থেকে আসা মানবিক কল্যাণচিন্তা, শুভবুদ্ধি এবং পরমতসহিষ্ণুতার এক সমন্বিত 'মানব শ্রেষ্ঠত্বে'র দর্শনের প্রতিষ্ঠা ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য প্রভাবজাত খণ্ডিত জাগরণ বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ তৃণমূলে কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি। কিন্তু ওই গ্রামীণ সাধক, মরমিয়া ও আউল-বাউল ফকিরদের লোকজ দর্শন বাঙালিকে একটি ঐক্যবদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় চেতনায় ঋদ্ধ করেছিল। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়টিকেই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এক

বাংলাদেশের ফোকলোর আমাদের লোকমানস ও লোকজ বিশ্ববীক্ষা নির্মাণে প্রাচীনকাল থেকেই দিক-নির্দেশক ভূমিকা পালন করে এসেছে। এ দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ ছিল নিরক্ষর, তবু আশ্চর্যজনকভাবে একথা সত্য যে ব্যাপক গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যগত থেকে যে জীবনরস, বিবেচনা-শক্তি, বিচার-বুদ্ধি ও বিশ্বদৃষ্টি লাভ করেছে, তাদের মানবীয় গুণাবলি বৃদ্ধি ও শ্রেয়-চেতনার উৎকর্ষ

সাধনে তার গুরুত্ব ছিল অনেক। প্রবহমান লোকজ সংস্কৃতি গ্রামীণ সমাজে চালু রেখেছে এক সুস্থ-সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, যা মানুষের মৌলিক মিলন ও সংহতির ক্ষেত্রকে করেছে প্রশস্ত। বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বাংলা দোহাকারদের রচনায়ও মানুষকে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব। অষ্টম-নবম-দশম শতকের ওই কবিতা এবং ভাবুক-সাধকদের জীবন-চর্যায় লোক-মানসে লোকায়ত দর্শনের ইহজাগতিক ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে; গড়ে উঠেছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরমতসহিষ্ণু এক সাংস্কৃতিক পদ্ধতি (cultural system)। বিভিন্ন ধর্ম, লোকধর্ম, কাল্ট এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং পরস্পরের মধ্যে সহ-অবস্থানের পথ করে নিয়েছে। নাথযোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, বাউল, বলাহাড়ি প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গ্রামীণ বঙ্গদেশে তৈরি হয়েছে মানবিক সৌহার্দ্যময় সম্প্রীতির এক পাটাতন।

এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিতে গড়ে ওঠা বাংলার লোকায়ত বাঙ্ময়ের (folkloric expressions) পরিবেশনকলা (performance) অষ্টম-নবম-দশম শতক থেকে দুটি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে। একটি বৌদ্ধ-জৈনদের প্রাকৃত ধারা; অন্যটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের শিষ্টধারা। বৌদ্ধ বজ্রযানিক ও শৈব-নাথপন্থী যোগী সিদ্ধাচার্য ভিক্ষুরা সাধারণ মানুষের স্তর থেকে উঠে আসতেন। ফলে তাঁদের লোকশিক্ষার কড়চা এবং লোকদর্শনে মানব-মাহাত্ম্যের কথাই প্রচার করতেন। ব্রাহ্মণ লেখক-পণ্ডিতদের মতো তাঁরা রাজসভার মনোরঞ্জন ও পণ্ডিতদের জন্য লেখেন নাই। লিখেছেন প্রাকৃতজনের ভাষায় এবং প্রাকৃতজনের জন্য। সুকুমার সেনের ভাষায়, 'সিদ্ধাচার্যেরা রাজসভার জন্য লেখেন নাই, পণ্ডিতগোষ্ঠীর জন্যও লেখেন নাই। তাহারা মহিমা ও পাণ্ডিত্য দুইই এড়াইয়া চলিতেন। পণ্ডিতদের উপেক্ষা ও ঘৃণা ছিল তাহাদের গর্বের বিষয়।...

গতানুগতিক ধর্মসংস্কারপাশবদ্ধ যাহারা চোখে আচার-বিচারের ঠুলি আঁটিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছে তাহাদের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা।'[১] তাঁদের লেখা একটি

তিব্বতে প্রাপ্ত চর্যাপদকর্তাদের রেখাচিত্র

কবিতায় যা বলা হয়েছে, তার বাংলা অনুবাদ এরকম, 'কি (হইবে) তোর তীর্থতপোবনে গিয়া? জলে ডুব দিলে কি মোক্ষ লাভ হয়?' অন্য একটি কবিতায় বলা হয়েছে, 'এই যপ-হোম মণ্ডাল-কর্ম রূপ ধর্মে কেন অনুদিন (লিপ্ত) আছিস?'[২]

প্রাচীনকালের সাধারণ মানুষের এই প্রাকৃত দর্শনকে লোকসাধারণের দর্শন বা লোকায়ত-দর্শন বলা চলে। সমাজের নিম্নবর্গের ভাবুক-সাধকেরাই ছিলেন এই দর্শনের স্রষ্টা ও অনুসারী। এ দর্শনে বস্তুবাদের বীজ থাকলেও এ-কালের আধুনিক বস্তুবাদী দর্শন একে বলা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল এক ধরনের আদিম বস্তুবাদী দর্শন। এই দর্শনকে ঘিরেই আমাদের এই উপমহাদেশে প্রাচীনকাল থেকে তৃণমূলের মানুষের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র গড়ে ওঠে। তন্ত্রবাদী এই দর্শনে বস্তু থেকে প্রাণকে আলাদা করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। তাই তারা প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই প্রাণের প্রকাশ লক্ষ করেছেন। সেদিন থেকে এঁরা ছিলেন সর্বপ্রাণবাদের (Animism) অনুসারী। সর্বপ্রাণবাদিতাই ছিল তাঁদের বিশ্ববীক্ষার মূলভিত্তি। আপন ইচ্ছাশক্তিতে সকল বস্তুর প্রাণকে তারা বশ করার সাধনায় নিয়োজিত হয়েছেন। আর এভাবেই তৈরি হয়েছে জাদুবিশ্বাস (magic belief)। তাদের বিশ্বাস ছিল, আপন ইচ্ছাশক্তি এবং গভীরতা নিষ্ঠায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশ করে মানুষ নিজের আয়ত্তে নিতে পারে। এখানেই ব্রাহ্মণ, অভিজাত এবং তথাকথিত পণ্ডিতদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের ছিল মৌলিক পার্থক্য। 'বস্তু জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোনো কাল্পনিক শক্তি উপর বিশ্বাসই ধর্মবিশ্বাসের মর্মমূলে বিদ্যমান; আর সেই শক্তির সন্তুষ্টি বিধানের যে অনুষ্ঠান তাই ধর্ম-অনুষ্ঠান। কিন্তু বস্তুর বাইরে তার পৃথক কোনো শক্তিকে সর্বপ্রাণবাদী আদিম মানুষের বিশ্বাস নেই। তাই, তাদের কামনা অনুযায়ী ও প্রয়োজনমাফিক বস্তুকে পরিবর্তন করার জন্য আত্মশক্তির উপরই তারা ভরসা রাখে, অন্য কোনো শক্তিশালী

চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তনের ভাবপ্লাবন

বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের ধামাইল গানের নান্দনিক উপস্থাপন

দেবতা বা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো স্তবস্তুতি-প্রার্থনা বা অনুষ্ঠানে আস্থা রাখে না। আপন ইচ্ছাশক্তি আরোপ করেই বস্তুকে দিয়ে তাদের প্রয়োজন সাধন করে নিতে পারবে বলে তারা বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসই জাদুবিশ্বাস।'[৩]

প্রাচীন বাঙালির ওই দর্শনচিন্তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় গঠিত হয়েছিল সহজিয়া বৈষ্ণব পুথিকারদের আদর্শ মানুষের চিত্র। এতে বলা হয়েছে :

শুদ্ধসত্ত্ব জীব যেই সদা নিষ্ঠাশীল।
সহজে অভেদভাবে দেখে যে অখিল।
বিষয়ের দাস্যে যেই না কাটায় কাল।
নয়নের দৃষ্টি যার চিত্তে চিরকাল।
ভালো মন্দ নাহি জানে নাহি করে দ্বেষ।
অন্তরে নিয়ত হেরে আপন মহেশ॥ (রস রত্নসার)

চতুর্দশ শতকের বৈষ্ণব-সহজিয়া পুথিকাররা ওই 'আদর্শ মানুষের' চিত্রকেই গ্রহণ করেছেন এবং তাদের বিবেচনায় এই মানুষের অধিষ্ঠান এমনকি ঈশ্বরেরও উপরে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকায়ত মৌখিক সাহিত্যে এই ধারাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাদের দর্শনের মূল কথাই হলো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। এই ধারাই চৈতন্যদেবের সময়ের লোককবির ভাষ্যে বিধৃত হয়েছে এভাবে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' অথবা 'ঈশ্বর মানুষ মানুষ-ভাব কভু নাহি পায়। পুনঃ পুনঃ ফুকারিয়া গ্রন্থকার কয়..। ঈশ্বর না হয় কভু জীবের সমান।' এই ধারাই আরও গভীরতা পেয়েছে দ্বিজ দাস এবং আরও পরের লালন সাঁইয়ের কবিতায়।

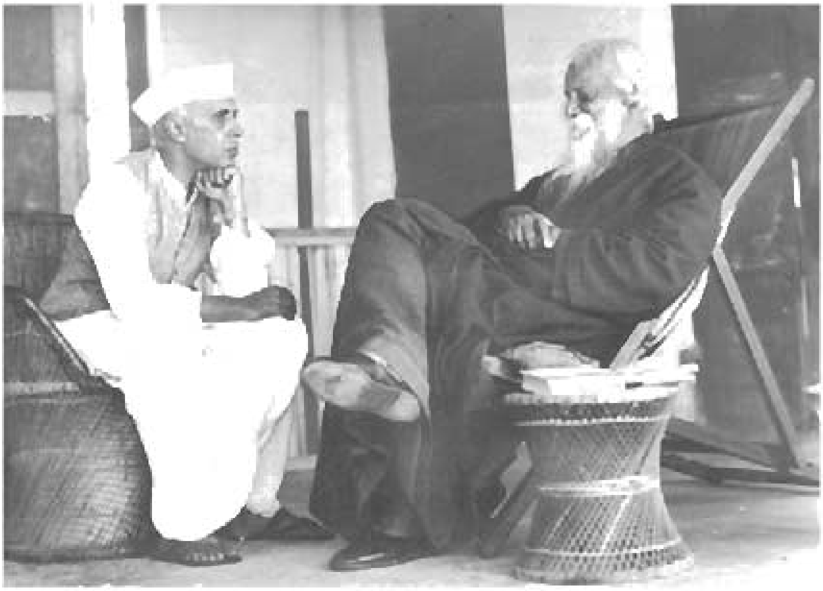

জওহরলাল নেহরু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলাপনরত

দুই

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতীয় সভ্যতার মৌল সত্তার বর্ণনা করতে গিয়ে যে রূপকল্পটি (Metaphor) ব্যবহার করেছেন তা হলো—'Palimpsests'...that Indian civilization is like some ancient Palimpsest, on which layer upon layer of thought and revery had been inscribed and yet no succeeding layer had completely hidden or erased what had been written previously. All of these existed together in our conscious or sub-conscious selves, thought w4e might not be aware of them.' অর্থাৎ বহুজাতিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতীয় বিকশিত হয়েছে। হাজার বছরের নানা সাধনানির্ভর সংস্কৃতির বিকাশ ধারায়ও এরকম স্তরের পর স্তর যুক্ত হয়ে তা এক শক্তিশালী সমন্বয়বাদী সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।

আমরা আগেই দেখেছি উপমহাদেশের ওই ধারার মতোই বাংলার মধ্যযুগের মানবতার পতাকাবাহী কবিরা বলেছেন, 'ঈশ্বর না হয় কভু জীবের সমান।' অথবা আরও সরাসরি 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির বিপুল উত্থানের সেই যুগে অমন মহৎ উচ্চারণ বাঙালিকে অসামান্য মর্যাদা দিয়েছে। বাংলার লোকমানসে গেঁথে যাওয়া এ বিশ্বাস ও বোধ আমাদের গ্রামীণ সামাজিক সংহতি ও সোশাল এনলাইটেনমেন্টের প্রধান কারণ। পরবর্তীকালেও অপরিবর্তনীয় গ্রামীণ সমাজের লোকদর্শনের ওই উত্তরাধিকার বহন করে তার সঙ্গে

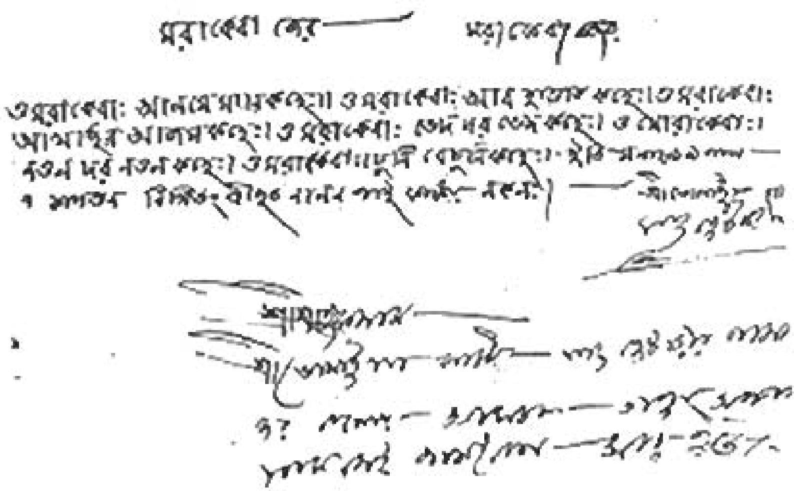

ফকির লালন সাঁই-এর গানের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি

যুক্ত করেন আরও তীব্র-তীক্ষ্ণ জীবন-জিজ্ঞাসামূলক প্রশ্ন ও পর্যবেক্ষণ। বাউল-সাধকদের বিশেষ তীক্ষ্ণমুখ ও প্রশ্নমুখর হয়ে উঠেছে। যেমন–

কী কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়
এক এক দেশে এক এক বাণী কয় খোদায় পাঠায়॥
এক যুগে যা পাঠায় কালাম অন্য যুগে হয় কি হারাম
এমনই মতে ভিন্ন তামাম ভিন্ন দেখা যায়॥
যদি একই খোদার হয় রচনা তাতে তো ভিন্ন ভেদ থাকে না
এ সকল মানুষের রচনা তাই তে ভিন্ন হয়॥
এক এক দেশে এক এক বাণী পাঠাই কি সাঁই গুণমণী
মুনষের রচিত জানি লালন ফকির কয়॥

হাসন রাজাসহ বাউল অনুসারী দুদ্দু শাহ্ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর জালাল খাঁ পর্যন্ত এই ধারাকেই পরিপুষ্ট করে গেছেন। মুসলিম আগমনের পর চৈতন্য যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অদ্বৈতবাদ (সোহম) এবং মুসলিম সুফিতত্ত্বের (আনাল হক) প্রভাবে জীবাত্মা পরমাত্মার অভিন্নতা প্রতিফলিত হওয়ায় মানুষ খুদা বা ভগবানের সত্তার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ফলে বৈষ্ণব সহজিয়া দর্শন ও মুসলিম সুফিবাদী দর্শনের সমন্বয়ে লোকায়ত দর্শন নবশক্তি লাভ করে।

আমাদের বিবেচনায় বাংলায় গ্রামভিত্তিক ব্যাপক নবজাগরণের ভিত্তিমূলে আছে লোকদর্শন ও তার উপজাত লোকজ সংস্কৃতি বা ফোকলোর। শুধু সামাজিক সুস্থতা, মানবিক মূল্যবোধ ও বিচারবুদ্ধি নয়, গোটা গ্রামবাংলাকে এক উদার মানবিক চেতনায় দীপ্ত করার ক্ষেত্রে লোকদর্শন এবং তার সাধক ভাবুক কবিয়াল বয়াতি ও গায়েনদের ভূমিকাই প্রধান।

এই জাগরণ গুরুত্ব ও ব্যাপকতায় উনিশ শতকের নগরভিত্তিক জাগরণের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীন সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের উদ্ভবের ক্ষেত্রেও লোকজ সংস্কৃতি ও সমন্বিত জীবনযাত্রানির্ভর এই জাগরণের গুরুত্ব বেশি বলেই মনে হয়।

তিন

ফোকলোর স্থবির (static) নয়, জঙ্গম, চলমান (dynamic)। আর্থসামাজিক, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে এর রূপান্তর ঘটে। নতুন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে (context) তৈরি হয় নতুন নতুন ফোকলোর ও তার আবাসস্থল (habitats)। এই রূপান্তরই লোকজ সংস্কৃতির প্রাণ। সমাজ পরিবেশ যদি খুবই তৈরি হয়ে ওঠে, তাহলে মূলধারার লোকজ সংস্কৃতি সাময়িকভাবে কিছুটা সুপ্ত অবস্থায় চলে যেতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে চলতি হাওয়ার পন্থি কোনো উপাদান সামনে আসতে পারে, তবে সেটা অনেকদিন একটা প্রলেপ হিসেবেই থাকে এবং একটু ভেতরের স্তরে নজর কাড়লেই দেখা যাবে মৌলিক উপাদানসমূহ প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই রয়ে গেছে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিংশ শতকের নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে বাংলা একাডেমি থেকে আমরা শ্রীমঙ্গল, মৌলভিবাজার, মাধবপুর, মোহনপুর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, পাইকগাছা এবং রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা এলাকা ঘুরে দেখেছি, পাকিস্তান আমলের সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

সংগীতই বাউল সাধকদের জ্ঞানসাধনার প্রধান অবলম্বন

এমনকি বাংলাদেশ আমলের সংস্কৃতি চর্চায় মুসলিম-প্রাধান্য (Muslim bias) সত্ত্বেও ভেতরে অটুট রয়েছে চৈতন্য আমলের কূলপ্লাবী 'কানু ছাড়া গীত নাই'-এর মূলধারার লোকসংগীতের প্রাধান্য। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গান, ধামাইল, কৃষ্ণলীলা, রামযাত্রা, ভাওয়াইয়া, কুশানগান, জারি, সারি, মুর্শিদি-মারফতি, দেহতত্ত্ব, বাউল গানের ফল্গুধারা অর্থাৎ সাবেক কালের সমন্বয়বাদী লোকজ-সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তির উপরে একটা আরোপিত আবরণই শুধু ধীরে ধীরে পুরু হয়ে উঠেছে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং সামরিক স্বৈরতন্ত্রসহ নানা সরকারের সাম্প্রদায়িকতা ঘেঁষা বা আধা সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক নীতির কারণে দেশের লোকজসংস্কৃতি একটা অনিশ্চিত অবস্থা এবং অস্থিরতার কাল অতিক্রম করছে। বেতার-টেলিভিশন বা ভিসিআরে গ্রামীণ সংস্কৃতি ভোক্তা যা পায় তা তাদের জন্য সহজপাচ্য নয়। কিছু বুঝে কিছু না বুঝে এক ধরনের মজা হিসেবে তারা একে গ্রহণ করতে পারে, বাকিটা থাকে তাদের সাংস্কৃতিক বোধ ও মানস পরিমণ্ডলের বাইরে; কারণ এই বিনোদন-উপাদান কোনো দীর্ঘ কালপরিক্রমা অতিক্রম করে দেশের মানুষের সংস্কৃতি-পদ্ধতির অংশ হয়ে ওঠেনি, ফলে এটা জাতিগত (ethnic) বা মানসিক মনস্তাত্ত্বিক ভৌগোলিক ভিত্তি পায়নি। অথচ এখন আগের মতো জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে উদ্ভূত সহজ স্বাভাবিক আনন্দময় জারি, মারফতি, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, কীর্তন-ভজন, গাজন, গাজীর গান, গম্ভীরা, আলকাপ, ভাসানযাত্রার দীর্ঘকালীন স্বকীয় সাংস্কৃতিক ভূগোলটির অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। গ্রামীণ ভাবুক-

জারিগান পরিবেশন করছেন মানিকগঞ্জের সংগীতসাধক সাইদুর রহমান বয়াতি ও তার দল

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় সাংগীতিক পরিবেশনরীতি কুশানগান

চিন্তকের বিচার গান, কবিগান, দেহতত্ত্বের গান, বাউল গানের তাত্ত্বিকতার সেই ঘনসংবদ্ধতাও এখন বিলুপ্তপ্রায়। এই গায়করাই ছিলেন গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী ও বিনোদন শিল্পী। একদিকে মৌলভি-মওলানা, স্কুলশিক্ষক, পণ্ডিত অন্যদিকে বেদ, পুরাণ, কোরআন, বাইবেল, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কারবালা কাহিনি, শরিয়ত-মারফত, নবি-কাহিনি, মা-ফাতেমা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সীতা সাবিত্রীসহ বহু বিচিত্র বিষয় ও বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এইসব কবিয়াল-গায়ক গাতক, বয়াতি, গীদাল, লোকসমাজের ধর্মীয় ও অন্যবিধ জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন তাঁদের তত্ত্বকথামূলক নানা গান, পালা ও কথকতায়। গ্রাম-জীবনের সেই সাংস্কৃতিক ধারা এখন অনেকাংশে উন্মূল। শত শত বছরের পুরনো বাংলার যাত্রাগান পর্যন্ত এখন স্বাভাবিকভাবে অভিনীত হতে পারে না। এবং গ্রামাঞ্চলে নতুন কোনো ধারাও গড়ে ওঠেনি। অপরাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থার হীন অবস্থা আধিপত্যবাদ, সন্ত্রাস ও নীতিভ্রষ্টতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক বিভ্রান্ত অবস্থা।

আগে গ্রামবাংলার মানুষ তিন চারটি প্রধান সূত্র থেকে তাদের সাংস্কৃতিক চাহিদার জোগান পেত। যেমন—

এক. ধর্মীয় উৎস: যথা—মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, ধর্মসভা, মিলাদ, ওরস, ওয়াজ, নামকীর্তন, পূজা, ঈদ ইত্যাদি। এ উৎস বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাত। এর কোনো কোনো অনুষ্ঠান-উৎসবে ধর্মীয় আন্তঃসম্প্রদায়ের লোকসমাগম ছিল বিশেষ লক্ষণীয়, এতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেধ্যে একটা সামাজিকতা ও প্রীতি-সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে;

দুই. লোকজ সংস্কৃতির উৎস: লোকজ সংস্কৃতি ছিল প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজের সাধারণ ঐতিহ্যগত সম্পদ। এতে আনন্দ লাভ এবং সাংস্কৃতিক রস-পিপাসা নিবৃত্তির মধ্য দিয়ে মানবিক চেতনা ও সামাজিক সম্প্রীতি একটা সংহত রূপ পেত, ফলে এটিই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ও মৌলিক সাংস্কৃতিক উৎস। এশিয়ায় ব্যক্তির চেয়ে সমাজের যে গুরুত্ব তার মৌল স্বরূপ এখানেই নিহিত;

তিন. গ্রামীণ রাজনীতি ও ভোট: পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন এবং জাতীয় নির্বাচনে এক ধরনের উৎসধর্মী রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে গ্রামীণ মানুষ। এটাও তাদের জীবনভাবনা ও জীবনধারাকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চতুর্থ ধারা—বেতার, টেলিভিশন, হিন্দি ও বাংলা সিনেমা, কম্পিউটার, সিডি-ডিভিডি প্লেয়ার, এনজিও কার্যক্রম, এমনকি মোবাইল ফোন পর্যন্ত। গ্রামীণ নিজস্ব সংস্কৃতি হিসেবে কৃষি ও শিল্পমেলা, মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা, কোথাও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, নববর্ষ উৎসব ও সঙ্গীতমেলা বা নাটক-বিচিত্রানুষ্ঠান, যাত্রাগান, গাজীর গান ইত্যাদি পরিবেশনা মাঝেমধ্যে হয়ে থাকে। এই চতুর্থ ধারা থেকে গ্রামবাংলার নতুন ইতিবাচক সংস্কৃতি ধারা গড়ে উঠে বর্তমান শূন্যতা পূরণ হবে এমন প্রত্যাশা আমাদের। তবে এই ধারার প্রবল শত্রুপক্ষ হলো স্যাটেলাইটে নিম্নমানের হিন্দি সংস্কৃতির আগ্রাসন এবং মৌলবাদের হিংস্র ছোবল।

পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক নীতি ও তার পক্ষে আদর্শগত প্রচার চলে তা বাঙালি জাতীয়তাবাদী সক্রিয় সংস্কৃতিকর্মীদের প্রবল আন্দোলন সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়ে গেছে এ কথা বলা যাবে না। ভাষা-আন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে

রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষ বরণ

ঢাকার বাংলা বর্ষবরণের মঙ্গল শোভাযাত্রা

সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবও সুস্পষ্টভাবে পড়তে থাকে। হাজার বছরের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সঙ্গে প্রকৃত সমন্বয়হীন নুতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের চেতনায় মুসলমানিত্বের ঝোঁক প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে রুটিরুজির সূত্রে বিপুল মানুষের মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সংযোগ প্রকৃত মর্মে না হলেও বাহ্যিকভাবে মানুষকে কিছু পরিমাণে সাম্প্রদায়িক করেছে। এই প্রভাব কাজ করেছে ধীরে ধীরে—প্রথমদিকে তা বোঝাই যায়নি; পরে স্পষ্ট হয়েছে।

পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকেও আমরা জারিগান, মুর্শিদি গানের সঙ্গে কৃষ্ণলীলা, রামযাত্রা, সীতার বনবাস এসবও হতে দেখতাম। পরে শেষোক্তগুলো প্রায় দেখাই যায়নি। অর্থাৎ লোকজ সংস্কৃতির উপরও রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রভাব পড়েছে।

বাংলাদেশ আমলেও পুরনো ধারার নতুন বিন্যাস ঘটেনি বরং পাকিস্তান আমলে সূচিত ধারাই ক্রিয়াশীল আছে। পাকিস্তানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক স্বৈরশাসকদের 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ', 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম', এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে রেডিও-টেলিভিশনে ধর্ম ও সংস্কৃতির যে ধরনের প্রজেকশন হয়েছে তাতে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির নিশ্চয়তা বিধানে ব্যর্থ হয়ে এরা প্রকৃত শিক্ষাবঞ্চিত মানুষকে ধর্মীয় আবর্তে টেনে নেয়। অনুন্নত দক্ষিণ এশিয়ার এও এক প্রবণতা।

চার

বাংলাদেশে শিক্ষার ভিত্তি অবৈজ্ঞানিক ও দুর্বল। সুচিন্তিত জাতীয়তাবাদী, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সুদীর্ঘ উত্তরাধিকার-নির্ভর উদার মানবিক শিক্ষাব্যবস্থা এখানে গড়ে না ওঠায় গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তিবাদ ও আন্তর্জাতিক সচেতনতা আমাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় হতে পারেনি। ফলে ধর্ম প্রবণতা, লাভ ও লোভ আমাদের জীবনে বড় হয়ে উঠেছে। এইসব আবিলতা এবং

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইসলামিকরণের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও সাম্প্রতিক কালে কিছু আশাব্যঞ্জক নতুন প্রবণতাও আমরা লক্ষ করছি। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন পাকিস্তান আমলে বাধার মুখে পড়েছিল। তবু 'ছায়ানট' (১৯৬১) ষাটের দশকে (১৯৬৭) রমনার বটমূলে যে ঐতিহ্যিক ভিত্তিটি অঙ্গীকারদীপ্ত প্রত্যয়ে গড়ে তুলেছিল আজ তা ভদ্রজনের মিলনমেলায় রূপান্তরিত হলেও বিপুল বিশাল নগরবাসী মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে ঐতিহ্য অন্বেষার এক নতুন পটভূমি তৈরি করেছে। উদার মানবিক ও এতিহ্যমণ্ডিত কিন্তু আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি এভাবেই নির্মিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথমখণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৩৯

২ পূর্বোক্ত

৩ যতীন সরকার, "বাঙালির প্রাকৃত দর্শন", *বাঙালির দর্শনচিন্তা*, ঢাকা, পৃ. ১৩৪

প্রবন্ধটি লেখকের বাঙালির বহুত্ববাদী লোকমনীষা (২০১৬) শীর্ষক গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত। তবে, ভাবনগরে প্রকাশিত এই প্রবন্ধের চিত্রসমূহ বিভিন্নসূত্র থেকে সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত।